উন্নয়নের ক্ষেত্র উন্মোচন করবে ব্লু ইকোনমি

মুহাম্মদ ফয়সুল আলম

সাগরের জলরাশি ও এর তলদেশের বিশাল সম্পদকে কাজে লাগানোই হচ্ছে সমুদ্র সম্পদনির্ভর অর্থনীতি বা ব্লু ইকোনমি। কেবল সমুদ্রের নীচের অর্থনৈতিক কার্যক্রম নয়, সমুদ্রনির্ভর যে কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডই ব্লু ইকোনমির আওতায় পড়ে। ব্লু ইকোনমির অন্যতম অনুষঙ্গ মৎস্য, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ আহরণ। বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূল এই ধরনের সম্পদে ভরপুর। বঙ্গোপসাগরের খনিজ সম্পদ বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য বিশাল এক আশীর্বাদ। এ কারণে ব্লু ইকোনমির পরিধি সমুদ্রের মতোই বিশাল। আগামী প্রজন্ম তাদের চাহিদা মেটাতে তাকিয়ে আছে সমুদ্রবক্ষে সঞ্চিত সম্পদের দিকে। বিশ্বের ক্ষমতাধর দেশগুলোও এই অর্থনীতিতেই ব্যাপক বিনিয়োগ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশও তার বিশাল সমুদ্র সম্পদের ওপর ভর করে দেশের আর্থিক উন্নয়ন করতে যাচ্ছে।

বঙ্গোপসাগরের বহুমাত্রিক সম্ভাবনার কথা বিবেচনায় রেখে সমুদ্রে বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র তিন বছরের মধ্যেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার 'দ্য টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট-১৯৭৪' প্রণয়ন করেন। মিয়ানমার ও ভারতের সাথে অমীমাংসিত সমুদ্রসীমা ছিল সমুদ্রে বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো অন্তরায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কূটনৈতিক সাফল্যের সুবর্ণ ফসল মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমার শান্তিপূর্ণ সমাধান। ফলে মিয়ানমারের সঙ্গে বঙ্গোপসাগরে ২০০ নটিকেল মাইলের মধ্যে সমুদয় অর্থনৈতিকঅঞ্চল ও তার বাইরে মহাদেশীয় বেষ্টনী এবং একইভাবে ভারতের সঙ্গে ৩৫৪ নটিকেল মাইল পর্যন্ত মহাদেশীয় বেষ্টনীর মধ্যে সকল প্রকার সম্পদের ওপর বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ সর্বমোট ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র অঞ্চল লাভ করেছে, যা মূল ভূ-খন্ডের প্রায় ৮০.৫১ শতাংশ।

মূলত বিশাল সমুদ্রজয়ের পর সমুদ্র অর্থনীতি ঘিরে নতুন স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে এই ব্লু ইকোনমির বদৌলতেই। ফলে ধারণা করা যেতে পারে সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেবে ব্লু ওশান ইকোনমি বা নীল সমুদ্র অর্থনীতি। এ জন্য সাগরের সম্পদ আহরণে নেওয়া হয়েছে অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কর্মপন্থা। ইতোমধ্যে সমুদ্র সম্পদ অনুসন্ধানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করেছে। অন্যদিকে উপকূলীয় অন্যান্য দেশের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পেতে আগে থেকেই নেওয়া হয়েছে কার্যকরী পরিকল্পনা। তাই মেরিটাইম বা সাগর সংক্রান্ত সম্পদ ব্যবহার করার মধ্যদিয়ে বঙ্গোপসাগরে নতুন অর্থনৈতিক দুয়ার উন্মোচন করার অপেক্ষায় বাংলাদেশ।

সমুদ্রজয়ের পর বাংলাদেশের অফশোর ব্লক ম্যাপ পুনর্বিন্যাস করে সমুদ্রাঞ্চলকে ২৬টি ব্লকে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে অগভীর অংশে ব্লক ১১টি আর গভীর সমুদ্রে ব্লক ১৫টি। বর্তমানে অগভীর সমুদ্রের তিনটি ও গভীর সমুদ্রের একটি ব্লকে মোট পাঁচটি আন্তর্জাতিক তেলকোম্পানি একক ও যৌথভাবে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কাজে নিয়োজিত আছে। যা থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সমুদ্রে শুধু মাছই রয়েছে প্রায় ৫০০ প্রজাতির। এছাড়াও শামুক, ঝিনুক, শ্যালফিস, কাঁকড়া, অক্টোপাস, হাঙ্গরসহ রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক প্রাণী, যেগুলো বিভিন্ন দেশে অর্থকরী প্রাণী হিসেবে বিবেচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রাণিসম্পদ ছাড়াও ১৩টি জায়গায় আছে মূল্যবান বালু, ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম। এগুলোতে মিশে আছে ইলমেনাইট, গার্নেট, সিলিমেনাইট, জিরকন, রুটাইল ও ম্যাগনেটাইট। এসব সম্পদ অতি মূল্যবান। তাছাড়া সিমেন্ট উৎপাদনের উপযোগী প্রচুর ক্লে রয়েছে সমুদ্রের তলদেশে।

ক্রমাগত সম্পদ আহরণের ফলে বিশ্বে স্থলভাগের সম্পদের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। তাই নতুন সম্পদের খোঁজে রয়েছে সারাবিশ্ব। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'সেভ আওয়ার সি'র তথ্য অনুযায়ী, সমুদ্র থেকে মাছ ধরে শুধু রপ্তানি করেই বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার আয়করা সম্ভব। গভীর সমুদ্র থেকে আহরিত টুনা মাছ সারাবিশ্বে খুবই জনপ্রিয়। সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী এই মাছটি দেশের আন্তর্জাতিক মানের হোটেলগুলোতে আমদানি করা হয়ে থাকে। এই মাছ সঠিকভাবে আহরণ করতে পারলে নিজ দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করাও সম্ভব। এ ছাড়া সামুদ্রিক মাছ থেকে খাবার, মাছের তেল দিয়ে বিভিন্ন প্রকার ওষুধ, সস, চিটোসান ইত্যাদি তৈরি করা সম্ভব, যার ফলে নতুন ধরনের কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি তা বিদেশে রপ্তানি করেও বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যেতে পারে। এসডিজি'র ১৪ নম্বর ধারায় টেকসই উন্নয়নের জন্য সামুদ্রিক সম্পদের অনুসন্ধান ও সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। আর তাই ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি পূরণের জন্য সামুদ্রিক সম্পদ আহরণে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে।

মৎস্য ও খনিজ সম্পদ আহরণের পাশাপাশি সমুদ্রের তীরবর্তী পর্যটনকেন্দ্রের মাধ্যমেও অর্থনৈতিক বিপ্লবের কথা ভাবছে বাংলাদেশ। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, প্রতিবছর বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় গড়ে এক হাজার হেক্টর করে ভূখণ্ড বাড়ছে। ব্লু ইকোনমি রূপরেখা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সমুদ্রে ভূখণ্ড আরও বাড়ানো সম্ভব। কৃত্রিমভাবে বাঁধ তৈরি করে পলিমাটি জমাট/চর জাগানোর মাধ্যমে সৃষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে মালদ্বীপের মতো দৃষ্টিনন্দন পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলাও সম্ভব। এতে দেশের অর্থনীতি

বহুমাত্রিকতা পাবে। ব্লু ইকোনমি সেলের মাধ্যমে জানা গেছে, মিয়ানমার থেকে সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে আমরা যে জায়গার অধিকার পেয়েছি, সেখানে বিপুল পরিমাণ সমুদ্র সম্পদ আছে বলে মনে করা হচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) পূরণের জন্য আমাদের সে সামুদ্রিক সম্পদ আহরণে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। সমুদ্র সম্পদ বা ব্লু ইকোনমি বিষয়ে সেল গঠনের মাধ্যমে আমরা অনেক এগিয়েছি।

সরকার ১৯টি মন্ত্রণালয়কে সমুদ্রে (বাংলাদেশ অংশে) কী পরিমাণ মৎস্যসম্পদ, খনিজসম্পদ, নৌচলাচলসহ কী ধরনের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা রয়েছে তা খতিয়ে দেখার পরামর্শ দিয়েছেন এবং পাশাপাশি সমুদ্র অর্থনীতির বিষয়ে নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা দ্রুত পাঠাতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, সমুদ্রে বিশাল সুযোগ রয়েছে, যা আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যের বিস্তারে সহায়ক। একটি সমৃদ্ধ এবং টেকসই সুনীল অর্থনীতির লক্ষ্যে দেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১২টি কার্যকলাপ উল্লেখ করা হয়েছে; যেখানে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মৎস্য চাষ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, মানবসম্পদ, ট্রান্সশিপমেন্ট, পর্যটন এবং জলবায়ু পরিবর্তন। এ ছাড়া ২০১৭ সালে সুনীল অর্থনীতি সম্পর্কিত উদ্যোগগুলোর সঙ্গে বিভাগীয় মন্ত্রণালয়গুলোর সমন্বয় সাধনের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়। চিহ্নিত করা হয় সুনীল অর্থনীতির ২৬টি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র; মৎস্য চাষ, শিপিং, জ্বালানি, পর্যটন, উপকূলীয় সুরক্ষাব্যবস্থা এবং এসবের জন্য নজরদারি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বঙ্গোপসাগরের অভ্যন্তরে ২০০ নটিক্যাল মাইলের একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ ৭১০ কিলোমিটার সুদীর্ঘ উপকূলরেখা রয়েছে। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের শতকরা ১৯.৪ ভাগই আসে সামুদ্রিক মৎস্য থেকে। এ ছাড়া দক্ষিণাঞ্চলের উপকূল এলাকায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক আর্থসামাজিক বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। পর্যটকদের গড়ে শতকরা ৮১ ভাগই কক্সবাজার ভ্রমণ করেন। দেশের সমুদ্রের অভ্যন্তরেও গ্যাস মজুদ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। দেশের স্থলসীমানায় কিছু গ্যাসক্ষেত্র রয়েছে; যা মোট মজুদের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারে। এ ছাড়া তেল, লবণ ও নবায়নযোগ্য সামুদ্রিক সম্পদের (বালু, নুড়ি ইত্যাদি) আছে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা।

দেশের বিশাল সাগরসীমায় কী আছে এবং সেই সম্পদ কাজে লাগিয়ে কীভাবে অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করা যায়, তা গবেষণা করতে ২০১৭ সালে কক্সবাজারে নির্মিত হয় সমুদ্র গবেষণাকেন্দ্র বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট। শুধু বঙ্গোপসাগরের তলদেশের সম্পদ গবেষণায় নিজেদের সীমাবদ্ধ না রেখে তা কীভাবে বাড়ানো যায়; সেই প্রচেষ্টাও রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির। বিশ্বব্যাংক বলছে, সুনীল অর্থনীতি হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উন্নততর জীবিকা সংস্থান এবং কাজের লক্ষ্যে সামুদ্রিক প্রতিবেশের উন্নয়ন। টেকসই উন্নয়নে সমুদ্রসম্পদের ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তা ছাড়া সমুদ্রসম্পদ খাদ্যের পাশাপাশি জ্বালানিও সরবরাহ করে।

২০১৮ সালের মধ্যভাগে জাতিসংঘের পতাকাবাহী নরওয়ের ইনস্টিটিউট অব মেরিন রিসার্চ (আইএমআর) পরিচালিত বিশ্বের অত্যাধুনিক গবেষণা জাহাজটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকায় অ্যাকুয়াস্ট্রিক সার্ভে পরিচালনার জন্য কাজ করে। জাহাজটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মৎস্য ও সম্পদ এবং ইকোসিস্টেমের ওপর ১৫ দিনের জরিপ করে। বিশেষায়িত জাহাজটি সমুদ্রের উপরিস্তরের মাছের মজুদ, ইকোসিস্টেম, পানির গুণাগুণ, প্লাস্টিকসহ নানা ধরনের দূষণ ইত্যাদি বহুমুখী বিষয়ে জরিপ চালায়। সমুদ্রের ১০ মিটার থেকে ২ হাজার মিটার গভীরতা পর্যন্ত জরিপ করেছিল জাহাজটি। যা আমাদের ব্লু ইকোনমির ক্ষেত্রে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।

সমুদ্রসম্পদের সুরক্ষার মধ্যে টেকসই ভারসাম্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুনীল অর্থনীতির বিকাশে আরও নজর দিতে হবে। এই খাতে নতুন বিনিয়োগ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকল্পে আরও ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পারে। এখন মৎস্য পালন, জাহাজ নির্মাণ, জাহাজভাঙা, লবণ উৎপাদন এবং বন্দর সুবিধাসহ কিছুসংখ্যক সুনীল অর্থনীতির ক্ষেত্র উন্মোচন করা গেছে। আরও ব্যবহার সম্ভব হলে ২০৪১ সালের আগেই উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছতে পারবে বাংলাদেশ।

#

৩০.০১.২০২২ পিআইডি ফিচার